একক ১৩ ❑ আরব জাতীয়তাবাদ (১৯১৯—১৯৫৬)

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ প্রস্তাবনা

১৩.২ আরব দুনিয়া—১৯০০

১৩.৩ আরব জাতীয় সত্তার উন্মেষ

১৩.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরব জাতীয়তাবাদ

 ১৩.৪.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরব জাতীয়তাবাদ

 ১৩.৪.২ সাইক্স-পিকো চুক্তি এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র

১৩.৫ আরব জাতীয়তাবাদের তিন ধারা

 ১৩.৫.১ উরবা **(Pan-Arabism)**

 ১৩.৫.২ ইসলামী উরবা

 ১৩.৫.৩ জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ

১৩.৬ জাতিরাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ ১৯২০—১৯৬৫

 ১৩.৬.১ লেবানন

 ১৩.৬.২ সিরিয়া

 ১৩.৬.৩ মিশর

 ১৩.৬.৪ ট্রান্সজর্ডন

 ১৩.৬.৫ ইরাক

 ১৩.৬.৬ সৌদি আরব

১৩.৭ প্যালেস্তাইন, ইজরায়েল এবং আরব দুনিয়া ১৯১৭—১৯৬৫

১৩.৮ সারাংশ

১৩.৯ অনুশীলনী

১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- আরব জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপট।
- আরব জাতীয়তাবাদের ধারাসমূহ।
- ১৯১৯—১৯৫৬ সময়কালে আরব জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি।

১৩.১ প্রস্তাবনা

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মত আরব দুনিয়াতেও বিংশ শতাব্দীতেই জাতীয়তাবাদ এক প্রবল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই এককে আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

এই এককের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কোন রাজনৈতিক তথা সামাজিক পশ্চাৎপটে অটোমান শাসনাধীন আরব দুনিয়ায় আরব সত্তার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন এবং তার পরবর্তীকালে সেই আরব সত্তা কীভাবে একাধিক রাজনৈতিক ধারার জন্ম দেয় তাও এই এককে আলোচিত হবে। সবশেষে, এই বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ১৯১৯-১৯৫৬ সময়কালের আরব রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হবে।

১৩.২ আরব দুনিয়া ১৯০০

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আরব দুনিয়ায় বস্তুতঃ কোন ধরনেরই জাতীয়তাবাদ দেখা যায় নি। আরব দুনিয়ায় এক বিশাল অংশ জুড়ে তখন অটোমান তুর্কী শাসন। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া এবং মিশর; ভূমধ্যসাগরীয় এশিয়ায় সিরিয়া, লেবানন এবং প্যালেস্তাইন, সাম্রাজ্যের পূর্বসীমায় পরবর্তীকালের ইরাক, আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত হেজাজ (Hejaz) অঞ্চল (যার অন্যতম দুটি স্থান হল মক্কা ও মদিনা)—সর্বত্রই অটোমান শাসন চলে আসছিল বহু শতাব্দী ধরে। এমন কি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের নেজ্‌দ (Nejd) অঞ্চল, ইয়েমেন এবং পূর্ব উপকূলের শাসকেরাও হয় অটোমান নয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতেন।

বর্তমানের আরব দুনিয়ায় বহু রাষ্ট্রেরই কোন ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক অস্তিত্ব ছিল না। যেমন অটোমান শাসনকালে ইরাক বিভক্ত ছিল বাগদাদ, বসরা, এবং মাসুল নামক তিনটি প্রদেশে; তৎকালীন সিরিয়া ছিল বহু প্রদেশে বিভক্ত যার একটা বড় অংশ বর্তমানে লেবাননের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানের জর্ডান রাজ্যের উত্তরাঞ্চল বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ছিল সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল প্যালেস্তাইনের অংশ বিশেষ। বর্তমানের ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইন অটোমান আমলে ছিল একটি অখণ্ড প্রদেশ। আরব উপদ্বীপ ছিল তিনভাগে বিভক্ত যার উত্তর তথা পশ্চিমে ছিল অটোমান শাসান।

প্রাদেশিক ঐক্যের অভাবকে আরও চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল অটোমান প্রশাসন যন্ত্র। মুষ্টিমেয় কিছু অঞ্চল বাদ দিলে, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে অটোমান সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় শাসন অনুপস্থিত ছিল। শাসনভার ন্যস্ত থাকত মূলত আঞ্চলিক প্রতিপত্তিশালী উপজাতীয় নেতা বা সেনাধ্যক্ষের হাতে। ফলে তুর্কী শাসনে আরব সমাজপতিদের রাজনৈতিক তথা সামাজিক প্রতিপত্তি কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তারা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে, আঞ্চলিক শাসকদের ক্ষমতা অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯শ শতাব্দীতে যেমন মিশর কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচালিত হত। ১৮৮০-র দশকে যখন মিশরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তা অটোমান সাম্রাজ্যে তেমন কোন প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি-মিশরের সঙ্গে সাম্রাজ্যের আর্থ-রাজনৈতিক যোগ এতটাই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

এ রকম চরম রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী আরবদের মধ্যে কোন সমষ্টি-চেতনা বিকাশের অবকাশ বিশেষ ছিল না। কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকে ঘটা কিছু পরিবর্তনের সুবাদহৈ এই চেতনার উন্মেষ সম্ভব হয়।

১৩.৩ আরব জাতীয় সত্তার উন্মেষ

অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায় প্রায় গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। পাশ্চাত্যের শক্তিগুলির প্রভাব ঠেকাতে অটোমানরা রাষ্ট্রযন্ত্র আধুনিকীকরণের জন্য সচেষ্ট হন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গা ছিল মূলত তুর্কী জাতিভুক্ত সামরিক বাহিনীর সংস্কার। সামরিক বাহিনীর সংস্কারের ফলে এক প্রগতিশীল গোষ্ঠী সমরবিভাগের পুরোভাগে উঠে আসেন, যাদের বলা হয় "তরুণ তুর্কী"।

১৯০৮ সালে "তরুণ তুর্কী"দের নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে এক অভ্যুত্থান হয়, যার দরুন তুরস্কে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। তরুণ তুর্কীদের ক্ষমতালাভের হাত ধরে জন্ম নেয় তুর্কী জাতীয়তাবাদ। নব উদ্যমে তুর্কী সামরিক এবং প্রশাসনিক এলিট (elite) সম্প্রদায় সমগ্র সাম্রাজ্যে তুর্কী আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করতে থাকেন, সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে।

আরব জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে মূলত এই নবাগত তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তুর্কী জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের আগে অটোমান সুলতানের ইসলামী দুনিয়ার খলিফা হিসেবে স্বীকৃতিই তাঁর মুসলিম প্রজাদের আনুগত্য পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নবাগত তুর্কী জাতীয়তাবাদে ইসলামের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায়, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্রমশ ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এই ক্ষোভ চরমে ওঠে যখন দেখা যায় যে ক্ষমতাসীন তুর্কী শাসকদের প্রণীত নীতির ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই আরব বণিক এবং পেশাজীবী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং লাভবান হচ্ছে শুধু তুর্কী জাতিভুক্ত প্রজারা।

আরব জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে মূলত শিক্ষিত পেশাজীবী এবং সম্পন্ন বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মূলত ইসলাম ধর্মালম্বী লক্ষাধিক লোকের মধ্যে জাতিসত্তার মূল সূত্র ছিল আরবীভাষা। লিবিয়া থেকে ইরাক অবধি ছড়িয়ে থাকা আরব সভ্যতায় সামাজিক চরিত্রে আরবী ভাষা ছাড়া অন্য গ্রন্থটি ছিল ইসলাম। কিন্তু অটোমান সুলতান স্বয়ং ইসলামী জগতেই খলিফা হবার দরুন তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যে আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তাতে আরবী ভাষার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। তাই প্রাক-১৯১৪ সময়কালে আরবী ভাষাভাষি মুসলিম, খ্রীশ্চান এবং ইহুদী প্রজারা একজোট হয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কীকরণের (Turkification) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তুর্কীকরণের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এবং আরব চেতনার উৎপত্তি, উভয়েই মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের আরব দুনিয়ার নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে।

শিক্ষিত পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মূল দাবী ছিল তুর্কী শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির অবসান ঘটানো। সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, অন্ততঃ প্রথম দিকে, এদের মূল দাবী ছিল বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন। কিন্তু জাতীয় সত্তার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আরও অনেক বিকল্পের সন্ধান মিলতে তাকে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আরব সত্তার সঙ্গে ইসলামী সত্তার

তথাকথিত “অবিচ্ছেদ্য” যোগের ধারণা। আব্দ আল-রহমান আল-কাওয়াকিবি (১৮৪৯-১৯০২) মত অনুসরণ করে অনেকে বলতে শুরু করেন যে প্রকৃতি ইসলামী উম্মার (কৌম, সমাজ) নেতৃত্ব দিতে শুধু আরবী জাতিভুক্তি খলিফাই পারে। এই মতানুসারে ইসলামের মূল্যবোধ বস্তুতঃ আরব মূল্যবোধেরই প্রকৃষ্ট রূপ। ফলে অটোমান শাসন কোন সচেতন আরব বা ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এই জাতীয় চেতনা অটোমান শাসনাধীন অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৮০-র দশক থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন মিশর এবং ১৯১২ থেকে ইতালীর শাসনাধীন থাকা লিবায়েতেও আরব জাতীয় চেতনার প্রভাব দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই চেতনা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত (এবং লিবিয়াতে প্রতিরোধ) গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এসব সত্ত্বেও প্রাক-১৯১৪ পর্বে আরব জাতীয় চেতনা প্রকৃত অর্থে আরব জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হতে পারে নি। সাধারণ মুসলিম প্রজার কাছে খলিফার বিরোধিতা করা অচিন্তনীয় ছিল। ফলে তুর্কী জাতীয়তাবাদের দরুন অটোমান সাম্রাজ্য যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুলতানের খলিফা হবার সুবাদে তা অনেকটাই পূরণ হয়েছিল।

১৩.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাদের জাতীয়তাবাদ

১৩.৪.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং আরব বিদ্রোহ

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে অটোমান সাম্রাজ্য এদের বিরুদ্ধে জার্মানির তরফে যুদ্ধে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানদের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে খলিফা তাঁর অংশগ্রহণকে জেহাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, আরব আনুগত্য বিষয়ে সন্দিহান তুর্কী শাসকেরা এক চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়। যাতে আরব উষ্মা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ শক্তি এই সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যে আরব ভাবাবেগকে প্রশয় দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। হালমী বংশোদ্ভূত (অর্থাৎ হজরত মহম্মদের বংশ) মক্কা শহরে শরিফ হুসেনের সামাজিক প্রভাবের কথা ভেবে মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দেন, যে তিনি তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ব্রিটেনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কিন্তু ব্রিটেন বাগদাদ, বসরা এবং লেবাননের উপকূল বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে নারাজ হওয়ায় শরিফ হুসেন বিদ্রোহ থেকে প্রথম বিরত থাকেন। কিন্তু আরবদের ওপর তুর্কী অত্যাচার চরমে ওঠা শরিফ হুসেন ১৯১৬ সালে সমগ্র আরব জাতিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানান। মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ T.E.Lawrence (Lawrence of Arabia) -কে পাঠান আরব বিদ্রোহকে এক সুংগঠিত অভ্যুত্থানের রূপ দিতে। ১৯১৭ সালের মধ্যে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে সমগ্র হেজাজ অঞ্চল এবং তারপরে প্যালেস্তাইন জয় করে নেন হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জল। ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ফয়জল এরপর ১৯১৮ সালে সিরিয়াকে তুর্কীশাসন থেকে মুক্ত করেন। অনতিবিলম্বে অটোমান সাম্রাজ্য পরাজয় স্বীকর করে আত্মসমর্পণ করে (অক্টোবর ১৯১৮)।

অন্যদিকে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী অটোমানদের হাত থেকে বর্তমান ইরাক জয় করে নেবার পাশাপাশি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের নেজ্‌দ অঞ্চলের শাসক আব্দল আজিত ইব্‌ন সৌদ-কে উৎসাহিত করে উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত জবল শম্মর অঞ্চল জয় করে নিতে। তুরস্কের সমর্থক ইবন রশিদের গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত

জবল শম্মর অঞ্চলে ইব্‌ন সৌদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়াতে প্রায় সমগ্র আরব দুনিয়াতেই অটোমান শক্তির পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ উপস্থিতি মজবুত হয়।

১৩.৪.২ সাইক্‌স-পিকো চুক্তি এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র

প্যালেস্তাইন, সিরিয়া এবং ইরাকের প্রভাবশালী লোকেরা ব্রিটেনের মদতে আরব বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা আশা করেছিল। মিশরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকম্যাহন শরিফ হুসনকে ১৯১৮ সালেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে উপদ্বীপের হেজাজ অঞ্চল এবং সিরিয়া-প্যালেস্তাইন থেকে বর্তমান ইরাক জুড়ে হুসেনের হালমী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

কিন্তু ১৯১৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়। এই সাইক্‌স-পিকো (Sykes-Picot) চুক্তি অনুসারে তুরস্কের একটা বড় অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সম্মত হয়। বিনিময়ে সিরিয়ার সংলগ্ন উপকূল অঞ্চল (অর্থাৎ, বর্তমান লেবানন), সিরিয়া এবং মসুলে ফ্রান্সের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়। ব্রিটেনকে প্যালেস্তাইনের ওপর অধিকার দেওয়া হয়। কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপেই কোন পশ্চিমী শক্তি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকে। তার ওপর ১৯১৭ সালে বালফোর (Balfour) ঘোষণা অনুসারে ব্রিটেন প্যালেস্তাইনে ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ বাসভূমি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

এ হেন পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশা এবং অঙ্গীকারের মধ্যে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র তৈরী হয়। প্রভাবশালী মার্কিন রাষ্ট্রপতি শান্তি সম্মেলনে স্ব-শাসনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করায় ভূতপূর্ব অটোমান সাম্রাজ্যের কোন অংশ সরাসরি ব্রিটিশ বা ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে লন্ডন এবং প্যারিস বিরত থাকে। পরিবর্তে ঠিক হয়, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্ব-শাসনের জন্য যথেষ্ট উন্নত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ (League of Nations)-এর আদি, (Mandate) অনুসারে ব্রিটিশ বা ফরাসী শক্তির অধীনে থাকবে।

বলা বাহুল্য আরব জাতীয়তাবাদী এর তীব্র বিরোধিতা করে। শরিফ হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জল দামাস্কাসে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার সমাজপতিদের সম্মতি অনুসারে এক অনর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছিলেন। ১৯১৮-১৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পাঠানো কিং-ক্রেন (King-Crane) কমিশন আরবদের অভিমতের সমীক্ষা করতে এসেই ফরাসী শাসন এবং ইহুদী বাসভূমির বিরুদ্ধে আরব ঐক্যমত সম্বন্ধে জানতে পারনে। কিং-ক্রেনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ব্রিটেন উপকূলবর্তী বেইরুটে এবং পরে সিরিয়াতে ফরাসী সেনা ঢুকতে দেয়। এর প্রতিবাদে আরব জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে ফরাসী সেনার হাতে আরবরা পরাজিত হয়। এবং অন্তর্বর্তীকালীন হালমী সরকারের পতন ঘটে।

জাতিসংঘের অনুমতিক্রমে ফ্রান্স নবনির্মিত (লেবানন এবং সিরিয়া রাষ্ট্র দুটির শাসক (Mandatory Power) হিসেবে নিযুক্ত হয়। ব্রিটেন প্যালেস্তাইন, মসুল, বসরা এবং বাগদাদ প্রদেশে শাসনাধিকার পায়। মসুল, বাগদাদ এবং বসরা (যার থেকে কুয়েত নাম বা অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়)-কে একত্রে এনে ইরাক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ব্রিটেন। জনরোষ সামাল দিতে দামাস্কাস থেকে ক্ষমতাচ্যুত ফয়জলকে ইরাকের রাজা ঘোষণা করা হয়। ইরাক যাকে দেবার কথা প্রথম ভাবা হয়েছিল, ফয়জলের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্‌কে তুষ্ট করতে জর্ডান নদীর উত্তরে অবস্থিত বেদুইন-প্রধান অঞ্চল প্যালেস্তাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সজর্ডান আমির শাহী সৃষ্টি করা হয়—এবং তা আব্দুল্লাহ্‌-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট অঞ্চল সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রাখা হয়, এবং ধীরে ধীরে ইহুদীদের অভিবাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এভাবে এই অঞ্চলে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জটিলতার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

১৩.৫ আরব জাতীয়তাবাদের তিন ধারা

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদ রাজনীতির মঞ্চে এক প্রবল শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। বহু শতাব্দী ব্যাপী তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আরব দুনিয়ার সর্বত্র ছিল নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ। এর মধ্যে অন্যতম ছিল একটি ন্যায় ও সংহত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন। রাষ্ট্রনির্মাণের কেন্দ্রে আরব জাতীয়তাবাদ থাকলেও, যুদ্ধোত্তর যুগে আরব জাতীয়তাবাদ তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—উরুবা বা Pan-Arabism (নিখিল আরবীয়তা) ইসলামী উরুবা (অর্থাৎ ইসলাম এবং আরবীয়তার যৌথসত্তা) এবং জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ (যেমন, মিশরীয় জাতীয়তাবাদ, সিরিয় জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি)। এর মধ্যে প্রথম দুটি ধারার অনুগামীরা জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের থেকেও আরব সত্তাকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। তৃতীয় মতাবলম্বীরা মনে করতেন ধর্ম, সামাজিক চরিত্র এবং ঐতিহাসিক কারণে আরব দুনিয়া এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল যে নিছক আরব ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র গঠন বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। এছাড়া ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। সুতরাং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্মরণে রেখে জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলাই যুগপোযোগী পদক্ষেপ হবে।

১৩.৫.১ উরবা (Pan-Arabism)

উরবা (Pan-Arabism বা নিখিল-আরবীয়তা) বলতে আরব জাতীয়তাবাদের সেই ধারাকে বোঝায় যা আরব জগতকে ধর্মীয় বা জাতিরাষ্ট্রের নামে বিভাজনের বিরুদ্ধে। উরুবার মূল উপজীব্য হল আরব ভাষাগত তথা সাংস্কৃতিক ঐক্যকে কেন্দ্র করে এক ঐক্যবদ্ধ আরব রাজনৈতিক ব্যবস্থা করে তোলা।

উরবা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সাতি আল-হাসরি (১৮৮০-১৯৬৮)। আল-হাসরির মতে কোন জাতি শুধু বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সমষ্টিগত ভাবে থাকার এবং চিহ্নিত হবার ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিতে পারে না। বাস্তবেও তার ভিত্তি থাকা আবশ্যক। এই বাস্তব ভিত্তি আসে ভাষাগত সাযুজ্য থেকে যা সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যমে আরও জোরালো হয়। আরবী ভাষার দৌলতে আরব জাতির যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে তা আল-হাসরির মতে অনস্বীকার্য।

আল-হাসরির অনুগামী উরবা মতাবলম্বীদের বক্তব্য ছিল যে নিখিল আরবীয় ঐক্যের ধারণা আরব জাতির অস্তিত্বেরই প্রমাণ মাত্র। আল-হাসরি এবং অন্যান্য উরুবাবাদীরা মনে করতেন এই আরব জাতীয় সত্তায়, আরব সংস্কৃতিতে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও একমাত্র বা অন্যতম উপাদানও নয়। ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও ঊর্ধ্বে উরুবাবাদীরা দেখতেন একটি সাধারণ আরবী জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ যা আরবীভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই আল-হাসরি এবং সমমনোভাবাপন্ন আরবদের চোখে আরব জাতিসত্তার ধর্মীয় ভেদাভেদের কোন স্থান ছিল না।

একইভাবে উরুবাবাদীরা জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদকেও মেনে নেননি। আল-হাসরি বলতেন ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে যে কোন মিশরীয় (এবং অন্য ক্ষেত্রে যে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী) তার দেশের অন্য যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে একটা ক্ষেত্রেই অভিন্ন—সেটি হচ্ছে ভাষা। তাই যে কোন আরবী ভাষাভার্ষী ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করা সম্ভব হলে, সেই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে নিখিল আরবীয়তায় বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।

ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আবার জাতিসত্তা সন্ধানের এই প্রয়াস অ-মুসলিম আরবদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর প্রথম দশকে মিশর সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাকে বসবাসকারী। খ্রিস্টান এবং অন্যান্য

ছোটখাটো ধর্মাচরণকারী জনগোষ্ঠী (যেমন— লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাকের শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়) খুব বড় সংখ্যায় উরবা মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উরবা মতবাদ কালক্রমে জনপ্রিয়তা হারালেও তা ১৯৫০-এর দশকে বাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে এই ধারণা কতকটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

১৩.৫.২ ইসলামী উরবা

ইসলামী উরবা হল আরব জাতীয়তাবাদের সেই ধারা যাতে আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিশ্রণ ঘটেছিল। জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবাদ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় যখন মাথা চাড়া দিচ্ছিল, এবং উরবা (Pan-Arabism) বা নিখিল আরবীয়তা) ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল, তখন ইসলাম এবং আরবীয়তার মিশ্রণে আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই মতবাদের উত্থান ঘটে।

বস্তুতঃ ইসলাম এবং আরবীয়তাকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবে দেখার প্রবণতা প্রাক-১৯১৪ যুগ থেকেই দেখা গিয়েছিল আব্দ আল রহমান আল-কাওয়াকিবি ইসলামী মূল্যবোধকে আরবী মূল্যবোধেরই উৎকৃষ্টতম নিদর্শন মনে করতেন। বিশ্বযুদ্ধের পরে এই চেতনাকে সুসংহত রাজনৈতিক মতবাদের রূপ দেন শাকিব আরস্লান (১৮৬৯-১৯৪৬)। ইসলামী পুনর্জাগরণের দুই অন্যতম রূপকার মহম্মদ আব্দুহ এবং রশিদ রিদার সংস্পর্শে এসে আরস্লান উরবা এবং ইসলামের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে লেবানন দ্রুজ (Druze) নামক ক্ষুদ্র এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও আরস্লাম গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আরব দুনিয়ার ঐক্যসাধনের পক্ষে সওয়াল করেন।

ইসলামী উরবার প্রবক্তরা মনে করতেন আরব সভ্যতা, আরব ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রেরণা ছিল ইসলাম। আরবীভাষা এবং আরব সংস্কৃতির প্রাক-ইসলাম পর্বে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির বর্জন এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমার্জিত এবং প্রকৃষ্ট রূপই হল ইসলাম। তাই ইসলামেরও যে সর্বজনগ্রাহ্য চরিত্র তা ছাড়াও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রাণকেন্দ্রে এক আরব জীবনবোধের নির্যাস দেখতে পেতেন ইসলামী উরবার প্রবক্তরা।

আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ উরবার তুলনায় ইসলামী উরবার গ্রহণযোগ্যতা বেশি হওয়া উচিত ছিল। তুলনামূলক জনপ্রিয়তার বিচারে দেখলে ইসলামী উরবা কতকটা এগিয়ে ছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাও ইসলামী উরবা বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে খুব একটা জনপ্রিয় হয় নি। তার কারণ ইসলামী উরবা মতবাদে আরব-ভ্রাতৃত্বের তুলনায় নিখিল ঐসলামিক ধারণার প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল এবং সে যুগে রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতে নিখিল ঐসলামিক মতবাদের (Pan-Islam) প্রভাব তেমন জোরালো ছিল না। ফলে ইসলামী চরিত্রের জন্যই ইসলাম উরবা জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে নি।

১৩.৫.৩ জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ

উরবা এবং ইসলামী উরবার বিপরীতে ছিল ছোট ছোট জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আরব জাতীয়তাবাদ। জনপ্রিয়তার নিরীখে এই সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবাদ সমূহ দুটি বিশ্বযুধে অন্তর্বর্তী সময়ে আরব রাজনৈতিক জগতে অগ্রগণ্য হয়েছিল।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আরব জাতীয়তাবাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ আরব দুনিয়ার বাস্তব এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অটোমান-সাম্রাজ্য উত্তর আরব দুনিয়ার যে নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র

তৈরী হয় তা কার্যত পশ্চিমী শক্তিগুলির স্বার্থানুসারে হলেও আরব সমাজে (কতকটা অজান্তেই) ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়ক হয়। তুর্কী শাসনকালে প্রশাসনের সুবিধার স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ধর্মীয়, উপজাতীয় প্রভৃতি) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বহু প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স নিজের স্বার্থে এরকম একাধিক প্রদেশকে যুক্ত করে, এবং ধর্মীয় উপজাতীয় বিবাদ সত্ত্বেও এগুলিকে 'ঐতিহাসিক' কারণে জাতিসত্ত্বা হিসেবে নির্দিষ্ট করে। যেমন অটোমান শাসিত সিরিয় প্রদেশগুলির উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে ফ্রান্স লেবানন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। জর্ডান নদীর উত্তরে অবস্থিত অংশটি প্যালেস্তাইনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সজর্ডান রাজ্যের জন্ম দেয় ব্রিটেন। অটোমান-শাসিত মেসোপটেমিয়ার বাগদাদ, মসুল এবং বসরা প্রদেশ যুক্ত করে সৃষ্ট হয় ইরাক। বস্তুতঃ মিশর এবং লিবিয়া ছাড়া আরব দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই অটোমান-উত্তর প্রশাসনিক বিভাজনকে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের রূপ দেওয়া হয়।

এই সদ্যসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকরা আরবী ভাষাভাষী হলেও ধর্ম, সম্প্রদায় বা উপজাতির কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। লেবাননে যেমন ১৮টি সম্প্রদায় সরকারীভাবে স্বীকৃত, সিরিয়াতেও কোন গোষ্ঠীরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো ছিল না। এই অঞ্চলে ১৯২০-এর দশকে তাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রগঠনের জন্য রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের অন্যতম কারণ তুর্কীশাসনমুক্ত হবার পরে আরব গোষ্ঠীসমূহ পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ণ প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতা উরবা এবং ইসলামী উরবার দরুন মজবুত হয়েছিল। জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হবার ফলে সবকটি রাষ্ট্রেই একাধিক গোষ্ঠী লাভবান হওয়াতে সেই গোষ্ঠীগুলি তাদের অনুকূল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—প্রথমত, সৃষ্ট রাষ্ট্রকে পশ্চিমী বলয় থেকে সরিয়ে আনতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে কাজ করা ; দ্বিতীয়ত, উরবা বা ইসলামী উরবার বলয় থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন রাখতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী জানানো।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আরব জগতে একাধিক ধরন দেখা যায়। যেসব দেশে অ-মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা নগণ্য ছিল না, সে সব ক্ষেত্রে সে অঞ্চলের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের সময় থেকে রাষ্ট্রচেতনার উপাদান খোঁজা হত। যেমন মিশরীয় জাতীয়চেতনায় আরবীয়তা এবং ইসলামকে মেনে নিয়েও মিশরের প্রাক-ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে অবশিষ্ট আরব দুনিয়ার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করা হত। একইভাবে, সিরিয় জাতীয়তাবাদকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে এবং আরব তথা ইসলামী বৃত্তের বাইরে রাখতে সে অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক সিরিয় রাষ্ট্রের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে হয়। সব থেকে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে লেবাননের ক্ষেত্রে। 'প্রাক-১৯১৯ লেবাননের আঞ্চলিক চেতনা ম্যারনাইট খ্রিষ্টান সত্ত্বাকে ঘিরে উঠেছিল। ১৯২০-এ নবনির্মিত বৃহত্তর লেবানন রাষ্ট্রে সিরিয়ার মুসলিম প্রধান উপকূলবর্তী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন জাতীয় চেতনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই নতুন রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে তুলতে সহায়ক হয় প্রাচীন ফিনিশীয় সভ্যতার সঙ্গে সদ্যোজাত রাষ্ট্রের এক কাল্পনিক যোগসূত্র, যার মূল ছিল মূলত সমুদ্র বাণিজ্য নির্ভর সামাজিক জীবনযাত্রা (যা কিনা ওই অঞ্চলের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য)।

যে সব ক্ষেত্রে অ-মুসলিম জনগণের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য সে সব রাষ্ট্রে জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য ইসলামি ছিল অন্যতম উপাদান। লিবিয়াতে সানুসিয়া সুফী সম্প্রদায়ের নেতা প্রথম ইদ্রিস গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ লিবিয়ার অধিবাসীদের সানুসিয়া ইসলামের সাহায্যে একত্রিত করেন এবং ইতালীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯১১ সাল থেকে প্রায় চার দশক ধরে ইতালীয় শাসনের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের দরুনই জন্ম নিয়েছিল লিবিয় জাতীয়তাবাদ। এমন কী বিশের দশকে যখন নেজ্‌দের শাসক

ইব্‌ন সৌদ সমগ্র আবর উপদ্বীপে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সৌদি আরব রাষ্ট্রের পত্তন করেন, ইসলাম হয়ে উঠেছিল তাঁর রাষ্ট্রনির্মাণের সব থেকে বড় উপাদান। ওয়াহবি ইসলামের সাহায্যে রক্ষণশীল বেদুইনের সহায়তায় ইব্‌ন সৌদ সমগ্র উপদ্বীপে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩.৬ জাতিরাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ (১৯২০—৫৬)

১৯২০ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের অন্তর্গত সান রেমো চুক্তি অনুসারে আরব দুনিয়ায় যে সব রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব ঘটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই সেগুলি নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক তথা রাজনৈতিক রূপরেখা পেয়ে যায়। '২০ এবং '৩০ এর দশক ছিল এ অঞ্চলে রাষ্ট্রনির্মাণের যুগ। কোন কোন দেশে রাষ্ট্রনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল পাশ্চাত্য শক্তির তত্ত্বাবধানে, অন্যত্র আঞ্চলিক নেতৃত্ব হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্র নির্মাণের মূল স্তম্ভ। বিভিন্ন রাজনৈতিক তথা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রত্যেকটি সদ্য নির্মিত রাষ্ট্রেই জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির থেকে পৃথক ছিল।

১৩.৬.১ লেবানন

১৯২০ সালে যে লেবানন সৃষ্টি হয়, তা অটোমান-শাসিত খ্রিস্টান প্রধান লেবাননের সঙ্গে সিরিয়ার কিছুটা অংশের সংযুক্তিকরণের ফল। রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা লেবাননের শাসনাধিকার প্রাপ্ত শক্তি (Mandatory Power) ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল লেবানন অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা, যাতে শাসক হিসাবে ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। ফলে নবনির্মিত লেবাননে উপকূল এবং পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয় উর্বর কৃষি জমি। কিন্তু একই সঙ্গে খ্রিস্টান প্রধান লেবাননে বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধিবাসীও নাগরিকত্ব লাভ করে, এবং মোট জনসংখ্যার নিরীখে খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়ে দাঁড়ায় প্রায় সমসংখ্যক।

জনসংখ্যার সংখ্যাগত এবং গুণগত পরিবর্তনের ফলে লেবাননের জাতীয়চেতনায়-এ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাক ১৯২০ পর্বে লেবাননে যে আঞ্চলিক সত্তা গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল সেখানকার খ্রিস্টানরা, বিশেষ অনুমতিবলে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়া যথাক্রমে ম্যারনাইট, প্রটেস্টান্ট এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি করেছিল সেগুলির সূত্রেই লেবাননের শিক্ষিত জনমানসে ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে—এর অন্যতম ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। লেবাননের খ্রিস্টানরা নিজস্ব ভেদাভেদের উর্দ্ধে উঠে বৈষম্যমূলক তুর্কী ব্যবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। অটোমান শক্তির পতনের পর তাঁরা তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন।

মুসলিম-প্রধান কৃষি অঞ্চল লেবাননের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে লেবাননের আর্থিক লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি। ফলে সদ্য সংযোজিত অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও লেবাননের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করতে ধর্মীয় চেতনার উর্দ্ধে উঠে জাতিরাষ্ট্রের নির্মাণকার্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে উরবা একটি বিকল্প হতে পারত, কিন্তু তা হলে লেবাননের স্বায়ত্বশাসন সম্ভব না হবার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

এ সমস্ত কারণে বিশের দশকে লেবাননের স্বাতন্ত্র্য জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে প্রাক-রোমান যুগের ফিনিশীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক লেবাননের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। নিখাদ "লেবানীয়" এই চেতনার কেন্দ্রে রাখা হয় সমুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রিক সমাজ জীবন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পদানত হবার পরেও এই বিশেষ লেবানীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের ইতিহাসই হয়ে ওঠে আধুনিক লেবানন রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর।

এই জীবনবোধের শরিক হিসেবে খ্রিস্টান (ম্যারনাইট, প্রটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স ইত্যাদি) এবং মুসলিম (সুন্নি, শিয়া, দ্রুজ) গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের এই জাতিভুক্ত বলে ভাবতে শিখেছে ১৯২০-এর দশক থেকে।

'২০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে লেবাননে ফরাসী শাসনের অবসানের দাবী উঠতে থাকে। ১৯২৬ সালে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় ফরাসীদের দ্বারা তাতে খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে ক্ষমতা সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। ক্ষমতার আনুপাতিক বন্টন যাদের মনঃপূত হয় নি, তারা উরবা বা সিরিয় জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁকেন। লেবানীয় জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা বন্টন মেনে নিলেও ফরাসী হাইকমিশনারের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ে অসন্তোষ জাহির করেন। ফলে ১৯৩২ এবং ১৯৩৯ সালে সাময়িকভাবে সংবিধান বিলম্বিত করা হয়। তবু সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুবাদে লেবাননকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেওয়ার দাবী উঠলে ফ্রান্স তা মেনে নেয়। ১৯৩৪ সালে জন্ম হয় স্বাধীন লেবাননের।

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল স্বাধীন হবার পরে যে যুদ্ধ হয় তাতে বহু প্যালেস্তিনীয় আরব লেবাননে আশ্রয় নেয়। ফলত লেবাননের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোয় যে চাপ পড়ে তাতে ইজরায়েলের প্রতি বিরূপ মানসিকতার জন্ম হয় এবং লেবাননের রাষ্ট্রীয় চেতনায় আরবী সত্তার প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। তবে লেবানীয় সত্তার এই বিবর্তন আরও প্রকট হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

১৩.৬.২ সিরিয়া

সান রেমো চুক্তি অনুসারে সিরিয়ার শাসনাধিকার পেয়ে ফ্রান্স আরব জগতের মানচিত্রে যে পরিবর্তনগুলি ঘটায় আধুনিক সিরিয়ার সৃষ্টি তার অন্যতম। ওমাইয়াদ বংশের শাসনকাল থেকে (৭ম শতাব্দী) প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মোটের ওপর সিরিয়ার যে প্রশাসনিক ঐক্য ছিল, লেবাননকে অটোমান-সিরিয়ার কিছুটা অংশ দিয়ে দেওয়াতে সেই ঐক্য প্রথম ভেঙে যায়। ফলে বিংশ শতাব্দীর সিরিয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে রয়েছে কতকটা ভূগোল এবং কতকটা ইতিহাস—কারণ সিরিয়ার গ্রহণযোগ্য কোন ভৌগোলিক সংজ্ঞা দেওয়াই সিরিয় জাতীয়তাবাদের মূল পরিচিতি।

প্রাক-১৯১৪ যুগে সুন্নি মুসলিম প্রধান সিরিয়ায় তুর্কী বৈষম্যের প্রতিবাদে আরব জাতীয়তাবাদের জোয়ার ওঠে এবং বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হালমী যুবরাজ ফয়জল ব্রিটিশ মদতে সিরিয়ায় উপস্থিত হলে অটোমানদের বিতাড়নে তিনি সিরিয়ার মদত পেয়েছিলেন। স্বাধীন আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পূরণের সম্ভাবনা যখন সান রেমো চুক্তিতে শেষ হয়ে যায়, ফয়জল সিরিয় অধিবাসীদের সমর্থনে পশ্চিমী শক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজ্য এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ফ্রান্স বাহুবলে রাজধানী দামাস্কাসে প্রবেশ করে এবং ফয়জল এবং উরবাপন্থীরা পালাতে বাধ্য হন।

শাসন কায়েম করতে গিয়ে প্রতি পদে সিরিয়ার সংখ্যাগুরু সুন্নিদের বিরোধিতার মুখে পড়ে ফ্রান্স সিরিয়ার একটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল লেবাননকে দিয়ে দেয়, এবং অবশিষ্ট সিরিয়াকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে দেয়। সুন্নি প্রধান আলেপ্পো এবং দামাস্কাস ছাড়া আলাওয়ি (Alawiye), শিয়াদের জন্য লাটকিয়া, তুর্কীপ্রধান আলেকজান্দ্রা এবং দ্রুজদের জন্য জাবাল দ্রুজ অঞ্চলে সৃষ্টি করা হয়—উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে সিরিয়াদের ঐক্য ব্যাহত করা। তার ওপরে, শহুরে শিক্ষিত সুন্নি আরবদের সামাজিক প্রাধান্য খর্ব করতে সিরিয় সেনাবাহিনীতে সংখ্যালঘুদের বেশি করে নিয়োগ করা হয়।

তবু ফরাসী শাসনের দমনমূলক চরিত্রের জন্য ফ্রান্স কোনদিন সিরিয়দের আনুগত্য পায়নি। সংখ্যাগুরু সুন্নি এবং সংখ্যালঘু শিয়া এবং খ্রিস্টান-সকলেই ফরাসী শাসনের বিরোধিতায় মুখর হয়। ১৯২৫ সালে আলাওয়ি

শিয়া এবং দামাস্কাসের আরব জাতীয়তাবাদীরা এক যোগে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়। বহু কষ্টে এই বিদ্রোহ দমনের পরে একদিকে ফ্রান্স যেমন একটু নমনীয় হয় তেমনই সিরিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমশ সাংবিধানিক রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন ; ১৯২৮ সালে এক সংবিধান সভা আহ্বান করা হয়, কিন্তু কোন খসড়া তৈরী হবার আগেই সেটিকে বাতিল করতে হয়—কারণ লেবানন, আলেকজান্দ্রা এবং জবল দ্রুজকে অখণ্ড সিরিয়ার অংশ হিসাবে দেখতে ফ্রান্স নারাজ ছিল।

১৯৩৬ সালে ফ্রান্স-এর সঙ্গে সিরিয়ার মৈত্রী চুক্তির সুবাদে সম্পর্কের উন্নতি হলেও ১৯৩৯ সালে তুরস্ককে আলেকজান্দ্রাত্তা প্রদেশ হস্তান্তরের বিরুদ্ধে সিরিয় জাতয়ীতাবাদীরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়ায় বিক্ষোভ চরমে উঠলে ১৯১১ সালে ভিশি সরকার সিরিয়াকে আংশিক স্বায়ত্বশাসন দিতে রাজী হয়। সেই বছরেই স্বাধীন ফ্রান্সের নেতা দ্যগল সিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন (যুদ্ধকালীন সহায়তার আশায়)। সেই অনুসারে ১৯৪৩ সালে সিরিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং ১৯৪৬ সালে সিরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

ফরাসী শাসনের অবসানের পরে সিরিয় জাতীয়তাবাদ মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বাণিজ্য নির্ভর গোষ্ঠী সিরিয় রাষ্ট্রের নির্ধারিত সীমায় সন্তুষ্ট থেকে দূরবর্তী আরব রাজ্য (যেমন মিশর এবং সৌদি আরব)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু কৃষি নির্ভর এবং ভূস্বামী গোষ্ঠীগুলি চায় বৃহত্তর সিরিয়া যাতে ১৯২০-এ হারানো কৃষিপ্রধান অঞ্চল (যা লেবানন, প্যালেস্তাইন, জর্ডান এবং ইরাকের অন্তর্ভুক্ত) ফিরে পাওয়া যায়। ১৯৫০-এর দশক থেকে তৃতীয় একটি ধারার আবির্ভাব ঘটেছে, যা সিরিয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আরবীয়তাকে যুক্ত করতে সচেষ্ট—এর অন্যতম প্রবক্তা ছিল ব্যাথ (Baath) পার্টি, বাথ শাসনক্ষমতা লাভ করে, ১৯৫৬ সালে এবং আজও সিরিয়া বাথ শাসনাধীন।

১৩.৬.৩ মিশর

প্রাক বিশ্বযুদ্ধ আমলেই মিশরের রাজনৈতিক বিবর্তন বাকী আরব দুনিয়ার থেকে এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে অন্যত্র যখন তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে আরবীয় সত্তা সবে জেগে উঠছে, মিশরে তখন আরবীয়তার পাশাপাশি মিশরীয় জাতীয়তাবাদ জোরালো আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে। এর অন্যতম কারণ ছিল ১৮৮০-র দশক থেকে মিশরের ওপর কার্যত নিরঙ্কুশ ব্রিটিশ আধিপত্য। ব্রিটিশ শাসনে একদিকে যেমন তুর্কী শাসনের থেকে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পায় মিশর, তেমনই অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে উঠতে থাকে। সান রেমো চুক্তিতে তাই ব্রিটেন জাতিসংঘের থেকে মিশরের শাসনাধিকার (Mandate) পেলেও ১৯২২ সালেই মিশরকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় ব্রিটেন। সুলতান ফাদ স্বাধীন মিশরের রাজা হন। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে যখন রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সংজ্ঞা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, মিশরে তখন মূল প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমাজের যোগ বিষয়ক। প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৯২৩ সালে এবং অবিলম্বেই প্রশ্ন ওঠে মিশরে ইসলামের ভূমিকা কি হবে?

চার দশকের ব্রিটিশ শাসনের ফলে মিশরে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রসার হয় তাতে সমাজের প্রতিপত্তিশালী এবং বিত্তশালী অংশ বিশেষ লাভবান হয়। এঁরা স্বাধীন মিশরের আধুনিকীকরণের তথা পশ্চিমায়নের পক্ষে সওয়াল করেন। এঁদের মতে ইসলাম ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব বিষয়, জনজীবনে তার কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে অন্যরা পশ্চিমায়নের বিরোধিতা করে সনাতন মিশরীয় ইসলামী জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষে দাবী রাখেন। এ দাবী বিশেষত তাঁদের যারা ব্রিটিশ শাসনে আনা পরিবর্তন হয় মেনে নিতে পারেন নি, নয়ত তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

আধুনিকীকরণ এবং পশ্চিমায়নের প্রবক্তারা মোটের ওপর শাসনযন্ত্র কুক্ষিগত করে রাখে এবং ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলে। পশ্চিমায়নের বিরোধী ইসলামপন্থীরা এবং কট্টর জাতীয়তাবাদীরা (যারা মিশরে ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান চাইছিলেন) সরকারের ওপর পশ্চিমী প্রভাবের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন, যা চরমে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন সরকারী সহায়তা পেলেও জনসমর্থন পায় নি। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইজরায়েল প্রসঙ্গে ব্রিটেন ইজরায়েলকে সমর্থন করায় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে আরব ভাবাবেগকে সামাল দিতে মিশর তাই ইজরায়েল রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে ভোট দেয়। পশ্চিমের প্রতি বিরাগও বাড়তে থাকে।

১৯৪৮ সালে সদ্য নির্মিত ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দুনিয়ার যুদ্ধে মিশরের সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, এবং তার পরে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের আগমনের ফলে মিশরের অর্থনীতিতে পড়া চাপের পরিণাম স্বরূপ নতুন রাজা ফারুক কোণঠাসা হয়ে পড়েন। মিশরকে ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত করতে না পারার দরুন তাঁর বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে, ১৯৫২ সালে তা এক অভ্যুত্থানের আকার নেয় এবং ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন, কট্টর জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনীর জেনারেল নাগিব এবং নাসের।

নাগিব এবং পরে নাসেরের অধীনে মিশর পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত হতে সচেষ্ট হন, যার চরম পর্যায় ছিল ১৯৪৬ সালে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইলেও এই কট্টর জাতীয়তাবাদীরা ইসলাম পন্থীদের সঙ্গে হাত না মেলানোই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। ফলে ৫০-এর দশকেও মিশরীয় জাতীয়তাবাদে ইসলামের প্রবেশ ঘটে নি।

১৩.৬.৪ ট্রান্সজর্ডান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব জগতে ট্রান্সজর্ডান (বর্তমান জর্ডন) সম্ভবত একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে জাতীয়তাবাদের মূল উৎস শাসক বংশের প্রতি আনুগত্য। ১৯২০-এর আগে ভৌগোলিকভাবে ট্রান্সজর্ডান ছিল প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিরিয়ার অধীনে। তাই এই অঞ্চলে কোন সময়েই কোন আঞ্চলিক চেতনা গড়ে ওঠেনি।

১৯২০ সালে সান রেমো চুক্তির পরে দেখা যায় যে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আরব বিদ্রোহের মূল স্তম্ভ হেজাজ-এর হালমি বংশকে যে আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হবে না। যুদ্ধ শেষের পরেও বলা হয়েছিল আরব উপদ্বীপে মক্কার শরিফ হুসেন রাজত্ব করবেন ; সিরিয়া থাকবে তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র ফয়জলের এবং মেসোপটেমিয়া থাকবে কনিষ্ঠ পুত্র আব্দাল্লাহ-এর অধীনে। কিন্তু সিরিয়া ফরাসী নিয়ন্ত্রণে যাবার পরে আব্দাল্লাহ জর্ডান নদীর উত্তরে (অর্থাৎ পূর্ব উপকূলে) সেখানকার বেদুইন গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করতে থাকেন সিরিয়া পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। হালমি বংশের ক্ষোভ সামাল দিতে সিরিয়া চ্যুত-ফয়জলকে মেসোপটেমিয়া বা ইরাক শাসন করতে ডাকা হয়। পাশাপাশি আব্দাল্লাহ্‌কে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে ইরাকের পরিবর্তে জর্ডান নদীর পূর্বে অবস্থিত বেদুইন অঞ্চলে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র আমীর শাহী সৃষ্টি করা হবে। আব্দাল্লাহ্ উপলব্ধি করেন যে বাহুবলে ফরাসীদের থেকে সিরিয়া পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব, তাই তিনি এ প্রস্তাব মেনে নেন। ১৯২৩ সালে জন্ম হয় ট্রান্সজর্ডান আমির শাহী।

আরব বিদ্রোহ চলাকালীন আব্দাল্লাহ ঐ অঞ্চলের বেদুইনদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে স্বাধীন আমীরশাহী হিসেবে জন্মলগ্নে এই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই ছিল আব্দাল্লাহ্ তথা সমস্ত হালমি বংশের অবলম্বন। সদ্যোজাত রাজ্যটিকে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা দিতে ব্রিটেন প্রশাসনিক, আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য করে। ফলে পাঁচ বছরের মধ্যেই ট্রান্সজর্ডান একটি সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যার ক্ষমতার মূল আধার ছিল ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব জগতের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী Arab Legion।

আব্দাল্লাহ্ তাঁর বেদুইন প্রজাদের আনুগত্য আদায় করতে আরবীয়তা এবং ইসলাম উভয়েরই ব্যবহার করেন। জনসংখ্যা প্রায় পুরোপুরি আরব এবং মুসলিম হবার ফলে রাজা তাঁর হজরত মহম্মদের হাশমি বংশোদ্ভূত হবার সুফল পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেন।

১৯৩০-এর দশকে উদারপন্থী ইস্তকলাল আন্দোলনের উত্থান ঘটলে আব্দাল্লাহ্ তাঁর বিদেশনীতি পরিমার্জন করতে থাকেন। উত্তরে সিরিয়া এবং দক্ষিণে হেজাদ অঞ্চল (সৌদি শাসিত) পুনরুদ্ধারে প্রকল্প ঘোষিত হলে ইস্তকলাল আন্দোলনও রাজাকে সমর্থন জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রান্সজর্ডান মিত্রশক্তিকে পূর্ণ সমর্থন দেয়—এই আশায় যে সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্তাইন এবং ট্রান্সজর্ডানকে মিলিয়ে একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে। কিন্তু মিশর, ফ্রান্স, সৌদি আরব কেউ-ই চায় নি অত শক্তিশালী একটি আরব রাজ্য সৃষ্টি হোক। ফলে ১৯৪৬ সালে আব্দাল্লাহ্‌কে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

উত্তর ১৯৪৬ পর্বে ইজরায়েলের জন্ম হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আব্দাল্লাহ্ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে Arab Legion-এর সাফল্যের দরুণ জর্ডান নদীর পশ্চিম তট (প্যালেস্তাইনের প্রায় ২০% অঞ্চল) ১৯৪৮ সালে ট্রান্সজর্ডানের অধীনে চলে আসে। সঙ্গে আসে সহস্রাধিক প্যালেস্তিনীয় শরণার্থী। আব্দাল্লাহ্ অবিলম্বে রাজ্যের নাম বদলে তা করে দেন জর্ডান। সমগ্র আরব দুনিয়া মনে করে এটি আব্দাল্লাহ্-র সুবিধাবাদ ও আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু আব্দাল্লাহ্-এর কাছে এটির সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের কোন বিরোধ ছিল না, কারণ তিনি একটি অখণ্ড আরব রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। তার প্রমাণ স্বরূপ আব্দাল্লাহ্ পশ্চিমতট জয়ের অব্যবহিত পরেই প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের নাগরিক অধিকার দিয়ে দেন—যা অন্য কোন আরব রাষ্ট্রে প্যালেস্তিনীয়রা আজ অবধি পায়নি।

১৩.৬.৫ ইরাক

১৯২০-এর দশকে স্থাপিত অন্য হাশমি রাজ্যটি ছিল ইরাক। অটোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের তিন প্রদেশ—মসুল, বাগদাদ এবং বসরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দখল করে নেয় ব্রিটিশ সেনা। ১৯২০ সালে জাতিসংঘের থেকে সান রেমো চুক্তি অনুসারে শাসনাধিকার পেয়ে ব্রিটেন এই তিনটি প্রদেশকে জুড়ে সৃষ্টি করে আধুনিক ইরাক।

জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে দেখলে ইরাক বহুধাবিভক্ত। ইরাকের অধিবাসীরা মূলত আরব হলে প্রায় ২০% লোক কূর্দ গোষ্ঠীভুক্ত। অর্ধেকের সামান্য বেশিসংখ্যক ইরাকী শিয়া ধর্মাবলম্বী, সুন্নি মুসলিমদের সংখ্যা তার কিছু কম। তাছাড়া ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নগর সভ্যতা থাকলেও বহু অঞ্চলে নগরায়ন দেখা দেয় নি। ব্রিটিশ শাসন যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, ১৯২০ সালে সেহেতু ব্রিটেনের প্রয়োজন ছিল, এমন কোন শাসক যে একাধারে ব্রিটেনের দীর্ঘকালীন স্বার্থরক্ষা করবে এবং সদ্যগঠিত রাষ্ট্রটিকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। হাশমি বংশ ছিল স্বাভাবিক পছন্দ কারণ হাশমি বংশ আরব গোষ্ঠীভুক্ত এবং তার ওপর খোদ মহম্মদের বংশ হওয়ায় শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে, আরবদের আনুগত্যের দাবীদার। তাছাড়া ব্রিটিশ সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়াতে হাশমি শাসনের ব্রিটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে পারত। তাই দামাস্কাস থেকে বিতাড়িত হবার পরে শরিক হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জলকে ইরাকের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ফয়জলের ছত্রচ্ছায়ায় যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ইরাকে গড়ে ওঠে তাতে হাশমি বংশের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তা মূলত ছিল আরব জাতীয়তাবাদ। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বোঝা যায় ১৯৩৩ সালে ফয়জলের মৃত্যুর পরে ইরাকের রাজনীতিতে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর উত্থানের মাধ্যমে। ১৯৩৬ সাল থেকে ইরাকের রাজনীতিতে প্রায় নিয়মিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে যার লক্ষ্য মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজার সমর্থন আদায় করা। একটি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন নুরি-আল-সইদ। অন্য গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন রশিদ আলি আল-গেলানি।

নুরি-আল-সইদ ব্রিটিশ সমর্থন লাভ করেছিলেন কারণ তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা মনে করতেন ইরাকের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি এবং সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। নুরির মতে ইরাকের আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ নিবিড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র স্থাপনের তিনি বিরোধী ছিলেন।

পক্ষান্তরে রশিদ আলি ও তাঁর গোষ্ঠী মনে করতেন যে ইরাকের উন্নয়ন ব্রিটিশ প্রভাবের জন্যই ব্যাহত হচ্ছে, এবং ইরাকের প্রকৃত উন্নয়ন পাশ্চাত্য দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলে সম্ভব নয়। এঁরা মনে করতেন আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক ঐক্য নিছক আর্থ-সামাজিক নৈকট্যের থেকে বেশি বাঞ্ছনীয়।

১৯৫৮ সাল অবধি হাশমি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রায় আড়াই দশকের শাসনকালে ইরাকের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ঘটা সত্ত্বেও বৃহত্তর জনজীবনে তার ইতিবাচক প্রভাব প্রকট হয়নি। ফলত নুরি এবং পশ্চিমায়নের বিরোধিতা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময়ে ইরাক ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তিবলয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করায় কট্টর জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সঙ্কটের সময়ে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি বিরাগ চরমে ওঠে। ওর দু-বছর বাদে এরা বিপ্লবের মাধ্যমে ইরাকের হাশমি রাজবংশ, নুরি এবং তাঁর অধিকাংশ অনুগামীদের হত্যা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩.৬.৬ সৌদি আরব

সৌদি আরবে আরব জাতীয়তাবাদের এক অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ ওই জাতিরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় চেতনায় আরবীয়তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইসলাম এবং উপজাতীয় জীবনযাত্রা। শাসকবংশের প্রতি আনুগত্য আদায়ে ধর্মীয় এবং সমাজব্যবস্থার এরকম ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত নেজদ্ নামক মরু অঞ্চলের শাসনভার ছিল ইব্ন সৌদ বংশের হাতে। ১৮শ শতাব্দীতে চরম রক্ষণশীল ওয়াহাবী ইসলামকে অবলম্বন করে সৌদি বংশ নেজদ্ অঞ্চলের বাইরে প্রভাব বিস্তারের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আরব আল-আজিজ্ ইব্ন সৌদের নেতৃত্বে সৌদি ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের দশকে ইব্ন সৌদ মরু অঞ্চলের বেদুইনদের সহায়তায় প্রথমে নেজ্দ (১৯০৬) এবং পরে আল-হাসা (১৯১৩) বা উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল জয় করে নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পেয়ে উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের অবশিষ্ট অঞ্চল আক্রমণ করেন ইব্ন সৌদ, এবং ১৯২০ সালে নেজ্দের উত্তরে অবস্থিত আসির অঞ্চলেও কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। মূলত ইব্ন সৌদের সামরিক সাফল্যের কারণেই শরিফ হুসেনকে ১৯২০ সালে সমগ্র আরব উপদ্বীপের পরিবর্তে হেজাজ অঞ্চলেই কর্তৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ১৯২৫ সালে ইব্ন সৌদ হেজাজের হাশমী শাসনের অবসান ঘটান, এবং নিজেকে হেজাজ এবং নেজ্দের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালে হেজাজ এবং নেজ্দ রাজ্য যুক্ত করে সৃষ্টি হয় সৌদি আরব।

সৌদি আরব, অর্থাৎ সৌদি শাসনাধীন আরব দেশে জাতীয় চেতনার মূলে ছিল ওয়াহাবী ইসলাম। আপসহীন একেশ্বরবাদী এই ইসলামী তত্ত্ব রক্ষণশীল বেদুইনদের আকৃষ্ট করেছিল। ইব্ন সৌদ বেদুইন সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন হবার পরে উপদ্বীপে ইসলামের এই রক্ষণশীল ধারা আরোপ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে মক্কা ও মদিনার কর্তৃত্ব পেয়ে তাঁর রাজ্যের প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র হবার দাবী আরও জোরালো হয়। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রাখার দরুণ তাঁকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়, এবং ১৯২৯ সালে বেদুইনদের আধা-সামরিক আধা-রাজনৈতিক সংগঠন ইখ্ওয়ান (Brotherhood)-এর বিদ্রোহেরও সম্মুখীন হন ইব্ন সৌদ।

কিন্তু শরিয়তি আইনব্যবস্থা রাষ্ট্রের আইন বলে ঘোষণার সুবাদে (এমনকি রাজাকেও সেই আইনের ঊর্ধ্বে না রাখতে) ইসলামের প্রতি ইব্‌ন সৌদের নিষ্ঠা নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ ছিল না।

সৌদি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বাঁধন হল আরব উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে রাজবংশ তথা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য যোগ। সমগ্র উপদ্বীপের উপজাতীয় আনুগত্য নিশ্চিত করতে ইব্‌ন সৌদের বংশের সঙ্গে সমস্ত উপজাতীয় নেতৃবর্গের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা শুরু করেন ইব্‌ন সৌদ। রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সমস্ত উপজাতীয় শক্তির উপস্থিতির ব্যবস্থা করেছিলেন ইব্‌ন সৌদ। ফলে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় শক্তিই রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সফল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তৈলজাত রাজস্ব রাষ্ট্রের মাধ্যমে সবার কাছেই পৌঁছানোতে রাষ্ট্রের সঙ্গে উপজাতীয় নেতৃবর্গের বাঁধন আরও মজবুত হয়েছে, এবং তার ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছে।

১৩.৭ প্যালেস্তাইন, ইজরায়েল এবং আরব দুনিয়া (১৯১৭-৫৬)

আরব জগতে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল অটোমান প্যালেস্তাইন অঞ্চলে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠা। ইজরায়েলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আরব রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তন শুরু হয়, বর্তমান পশ্চিম এশিয় রাজনীতির সংঘর্ষ-প্রবণতা তারই পরিণাম।

প্যালেস্তাইন হলো অটোমান সাম্রাজ্যের আরব প্রধান একমাত্র অঞ্চল যেখানে কোন আরব রাষ্ট্র স্থাপিত হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেও অটোমান সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত প্যালেস্তাইন অঞ্চলে আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না। ইহুদী, খ্রীশ্চান এবং মুসলিম—এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই প্যালেস্তাইন এবং মূলত জেরুজামেলের বিশেষ তাৎপর্য থাকাতে আরব গোষ্ঠীভুক্ত খ্রীশ্চান এবং মুসলিমরা ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছিল। অটোমান শাসনকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার দরুন কোন সময়েই তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৮৯০-এর দশকে থিয়োডর হার্জল (Theodore Herzl) ইউরোপের সর্বত্র ইহুদী বিদ্বেষের নির্মম রূপ দেখে (Ziomist) আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলন বিশ্ব জুড়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা ইহুদী ধর্মের অনুগামীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। কিংবদন্তী অনুসারে জেরুজালেমেই সুদূর অতীতে ইহুদীদের বাসস্থান ছিল, যেখান থেকে কালক্রমে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়। হার্জলের আন্দোলনে সেই অতীতের ইহুদীদের রাজ্য জুডেয়া (Judea) যেখানে ছিল সেখানেই ইহুদী জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। এ অঞ্চলে অটোমান শাসিত প্যালেস্তাইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে ইহুদীরা এ অঞ্চলে জমি কিনে যৌথ খামার (Kibbute) স্থাপনেই নিজেদের সীমিত রেখেছিল। অঞ্চলের জাতি-বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখতে অটোমান শাসকরা খুব বেশী সংখ্যক ইহুদীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদী পুঁজিপতিদের সাহায্য পেতে ব্রিটেন সচেষ্ট হন। ফলে ১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণা অনুসারে ব্রিটেন প্যালেস্তাইনে ইহুদীদের একটি বাসভূমি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সান রেমো চুক্তির দরুন ব্রিটেন প্যালেস্তাইন শাসনের অধিকার পেয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্যালেস্তাইনে ইহুদীদের অভিবাসনের ব্যবস্থা করে। Jewish Agency, ভাদ লিউমি প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে আরবদের থেকে জমি কেনা বিপুল

সংখ্যায় বেড়ে যায়, এবং ইহুদী অধিবাসীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালে প্রায় ২৫০টি বসতিতে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ ইহুদী প্যালেস্তাইনে বসবাস করেছিলেন।

প্রথম দিকে উষর জমি ইহুদীদের কাছে চড়া মূল্যে বেচে দিতে আরবরা দ্বিধা করেনি। কিন্তু বিশের দশক থেকেই ইহুদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সামান্য সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এই সমস্যা একটি অর্থনৈতিক রূপ নেয় যখন দেখা যায় যে ইহুদীরা তাদের খামার বা অন্যান্য উদ্যোগে আরবদের যুক্ত করার চেয়ে অন্য ইহুদীদেরই বেশী প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট।

বিশের দশকে ইহুদী অভিবাসনকে কেন্দ্র করেই বস্তুত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ প্যালেস্তিনীয় আরবরা প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা করে। কিন্তু প্যালেস্তাইনের সামাজিক চরিত্র এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্যালেস্তিনীয় সমাজপতিরা মূলত ভূস্বামী শ্রেণীর, ফলে এদের মূল সামাজিক প্রভাব নগরাঞ্চলের বাইরেই বেশী ছিল। মুষ্টিমেয় শহুরে মধ্যবিত্ত এবং পেশাজীবী শ্রেণীর লোকেরা প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকার সুবাদে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সমাজপতিদের প্রভাবে খানিকটা ভাগ বসাতে সক্ষম হয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে নগরকেন্দ্রিক সমাজপতিরা চেয়েছিলেন প্যালেস্তাইন বৃহত্তর সিরিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে খ্রীশ্চান এবং মুসলিম আরবরা যৌথ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রপাত করেন। ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম এক শহুরে সমাজপতিদের থেকেই প্রতিবাদ দেখা দেয়।

বিশের দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে যে তীব্র জন-আন্দোলন শুরু হয় তার উদ্যোক্তা ছিলেন মূলত ভূস্বামী এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গ। জেরুসালেমের মুফতি আল-হজ মহম্মদ আল-হুসেইনী ইহুদী অভিবাসনের প্রতিবাদ করতে জন সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করেন। প্যালেস্তিনীয় সমাজের শিক্ষার প্রচলন তেমন না থাকায় সেখানকার আরবদের তুচ্ছ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে একমাত্র অবলম্বন হতে পারত ইসলাম। আল-হুসেইনী আরব জাতীয়চেতনাকে ইসলামের সঙ্গে একীকৃত করে ইহুদী জাতির চেতনার মোকাবিলা করতে চান। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আল-হুসেইনীর প্রতিপক্ষরাও একইভাবে ইসলাম এবং প্যালেস্তিনীয় জাতীয় সত্তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা খুব সচেতনভাবেই নিজেদের আল-হুসেইনী এবং তাঁর ইহুদী বিদ্বেষের থেকে দূরে রাখেন। ফলে বিশের দশকে প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধ আন্দোলন বিশেষ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

১৯৩০-এর দশকে ইহুদী সংখ্যা ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সমাজপতিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, খ্রীশ্চান-মুসলিম অবিশ্বাস ইত্যাদি বিভাজন রেখা অতিক্রম করে প্যালেস্তিনীয় যুবসমাজ ক্রমশ চরমপন্থী হয়ে ওঠে, ব্রিটিশ এবং ইহুদী—উভয়েই প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হতে থাকে। কিছু ইহুদী গোষ্ঠী এই চরমপন্থী আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিলে আরব-ইজরায়েলী সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ অভিবাসনের নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। ঠিক যে সময়ে জার্মানীতে ইহুদী নির্যাতন চরমে ওঠে, সেই সময়ে অভিবাসন কেন্দ্র করে আনুপাতিক হারে চড়তে থাকা আরব-ইহুদী উত্তেজনার পারদ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এবং সর্বোপরি আরবদের ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে ধরে রাখতে ইহুদীদের অভিবাসন এবং জমি কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে আরব অভ্যুত্থান না ঘটলেই ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর হয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে থাকে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরব-ইহুদী সংঘর্ষ আবার চরমে উঠতে থাকে। এই রকম উত্তেজক পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘকে জানায় তারা প্যালেস্তাইন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চায়। আরব-ইহুদী উত্তেজনার দরুন ব্রিটেনের অনুপস্থিতিতে অবস্থা অগ্নিগর্ভ হবার

আশঙ্কায় রাষ্ট্রসংঘ UNSCOP (United Nations Special Commission of Palestine) বা রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত বিশেষ কমিশন প্যালেস্তাইনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

সরেজমিনে গিয়ে UNSCOP দ্বিধাবিভক্তি হয়ে ফিরে আসে। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা প্যালেস্তাইনে ইহুদী এবং আরবদের জন্য দুটি পৃথক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের প্রস্তাব করে। কমিশনের সংখ্যালঘু সদস্যরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে আরব-ইহুদী সহাবস্থানের কথা বলে। জেরুসালেমে উভয়পক্ষই আন্তর্জাতিক শাসনের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে আরব দুনিয়া এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানায়—তার ঘোষণা করে প্রয়োজনে বাহুবলে প্যালেস্তাইনের বিভাজন তারা রুখবে।

প্যালেস্তাইনের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে আরব দেশগুলি সামরিক সমাধানের কথা ভাবে মূলত দুটি কারণে, প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিমী প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক আবর দেশগুলিতে প্রায় সর্বত্রই নিখিল আরবীয়তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—বিশেষত জাতিরাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের সুফল সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমিত থাকার কারণে। এই প্রবণতা থেকে ১৯৪৫ সালে সৃষ্টি হয়েছিল আরব লীগ-যার অন্যতম উদ্যোক্তা জর্ডান, ইরাক এবং মিশর। নিখিল আরবীয়তা প্যালেস্তাইন প্রশ্নে আরব দুনিয়ায় যে পাশ্চাত্য বিরোধিতার জোয়ার তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তারই ফলে আরব দেশগুলি সামরিক বিকল্পের কথা ভাবে—নচেৎ আরব সরকারগুলির জনপ্রিয়তা হারাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, জনমতের আড়ালে আরব রাষ্ট্রগুলির দুরভিসন্ধিও কিছু ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। যেমন, মিশরের অভিপ্রায় ছিল প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত সিনাই অঞ্চলের দখল নেয়া। ইরাকের উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্তাইনের হয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তুতি চালানো। তবে বিনিময়ে ইরাক চাইছিল সিরিয়ায় ইরাকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরাকের সম্মতি, ট্রান্স জর্ডানের উদ্দেশ্য ছিল জেরুসালেম অধিকার করে নেওয়া। প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ না থাকাতে সৌদি আরব সামরিক সমাধানের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টাও করেনি।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটেন প্যালেস্তাইন থেকে সেনা অপসারণ করা মাত্র মিশর, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন একজোট হয়ে সদ্যোজাত ইজরায়েল আক্রমণ করা স্থির করে। সেনা অপসারণের আগের দিন ডেভিড বেন-গুরিয়ন (David Ben-Gurion)-এর নেতৃত্বে Jewish Agency ইজরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন করলে, আরব উষ্মা আরও বেড়ে যায়। ফলে ব্রিটিশ সেনা অপসারণের অব্যবহিত পরেই মিশর, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন একজোট হয়ে ইজরায়েল আক্রমণ করে, দু'দফার আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধের পরে ইজরায়েল আরব দেশগুলির যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করে আরব সেনাবাহিনীগুলি বিতাড়নে সক্ষম হয়। প্যালেস্তিনীয় আরবরা এর পরে প্রাণভয়ে প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে পালাতে বাধ্য হয়। প্রায় পাঁচ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এক আরব লীগের সদস্যগুলির কাছে তাদের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন এবং স্বাধীনতার দাবী জানাতে থাকে।

রাষ্ট্রসংঘের করা প্যালেস্তাইনের বিভাজন অনুসারে প্যালেস্তাইনের ৫৭% অঞ্চল ইজরায়েলকে দেওয়া হয়েছিল। আরবরা এই বিভাজন মানতে নারাজ ছিল কারণ প্যালেস্তাইনের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং ৫৫% জমির মালিকানা ছিল আরবদের। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধের ফলে জর্ডান নদীর পশ্চিমতট (West Bank) ট্রান্সজর্ডান অধিকার করে নেয় ; আরব প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট এলাকা ইজরায়েলের অধীনে চলে আসে। ফলে পলাতক প্যালেস্তিনীয়দের ইজরায়েল অধিকৃত প্যালেস্তাইনে প্রত্যাবর্তন এবং আরব দুনিয়ার অন্যত্র থেকে যাওয়া ছাড়া তৃতীয় একটি বিকল্প থেকে যায়—তা হল আরব রাষ্ট্রগুলিকে ইজরায়েলের ওপর চাপ বজায় রাখতে বাধ্য করা। প্রায় সর্বত্র প্যালেস্তিনীয়রা এই তৃতীয় বিকল্পটিই বেছে নেয়।

আরব দেশগুলিতে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের উপস্থিতি দুটি কারণে খুব উত্তেজক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, ইজরায়েল রাষ্ট্রস্থাপনে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রত্যক্ষ মদত পশ্চিম-বিরোধী আরব জনমতকে আরও তীব্র করে তোলে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় আরব দেশগুলির সামরিক দুর্বলতা—অর্থাৎ সরকারের অকর্মণ্যতা স্পষ্ট দেখা যায়। এই দুই কারণে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ বাড়তে থাকে, এবং পশ্চিমায়নের সমর্থক বা পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখায় সরকার চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই রাজনৈতিক বিরোধিতার পুরোভাগে ছিল মূলত উরবাপন্থী শিক্ষিত সামরিক পদাধিকারীর দল। এদের চাপের ফলে ১৯৪৯ সালে অধিকাংশ দেশ আলাদাভাবে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরাম ঘোষণা করলেও কোন আরব রাষ্ট্রই ইজরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃত দেয়নি।

১৯৫০-এর দশক থেকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ আবর দুনিয়ার ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে এবং সামরিক পদাধিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে শুরু করে। ১৯৫০-এর দশকে এই উরবাপন্থীরা আরব শাসকবর্গ মিশর, সিরিয়া এবং ইরাকে ক্ষমতায় আসে—আবার জেগে ওঠে বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের স্বপ্ন। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী স্বাধীনভাবে চলার পরে ঐক্যবন্ধ আরবরাষ্ট্র গঠন করা বা তার প্রচেষ্টা করার উৎসাহ কতকটা স্তিমিত হয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে তাই উরবা বিদেশনীতি আরব ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলেও, আদতে জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্রিক জাতীয় চেতনাই আরব দুনিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক মতবাদ বলে স্বীকৃত হয়।

১৩.৮ সারাংশ

আরব জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তার আগে অবধি অটোমান তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র আরব দুনিয়া জাতিগত কারণে বৈষম্যের শিকার না হওয়াতে আরব সত্তা জাগ্রত হয় নি। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর উত্তরোত্তর তুর্কী বৈষম্যের শিকার আরব ভাষাভাষীরা ঐক্যবন্ধ হবার কারণ সম্বন্ধে সচেতন নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সদ্যোজাত আরবজাতীয় সত্তা বিশাল ব্যাপ্তি পায়। সমগ্র আরব জগতে জাতীয়তাবাদীদের প্রত্যক্ষ মদত দেয় অটোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকার। অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মক্কার হালেমি বংশোদ্ভূত শরিফ হুসেনীর নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহের সূচনা হয় ; আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ইব্‌ন সৌদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ; মেসোপটেমিয়া ব্রিটিশরা জয় করে নেয়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে আরব দুনিয়ায় আধিপত্য বজায় রাখার ইদ্-ফরাসী অভিপ্রায় মার্কিন স্বশাসনের নীতি সমর্থনের কারণে ভেস্তে যায়। ফলে আরব দুনিয়াকে ব্রিটেন বা ফরাসী শক্তি তত্ত্বাবধানে রেখে স্বশাসনের অঙ্গীকার নিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আরব দুনিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদের তিনটি রূপ দেখা যায়।

উরবা বা নিখিল আরবীয়তা আরব জগতে সমগ্র বাসিন্দাকে একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করে। ধর্ম, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস—এ সবের উর্ধ্বে আরবভাষা এবং সংস্কৃতি ঘিরে যে আরব মূল্যবোধ রয়েছে উরবাপন্থীরা সেই বোধকে আরব জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে মনে করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর আরব রাজনৈতিক ঐক্য।

ইসলামী উরবা পন্থীরা মনে করতেন আরবীভাষা এবং ইসলামী ধর্ম এবং সংস্কৃতিই ছিল আরব জাতীয় চেতনার আধার। আরব সংস্কৃতি, আরব মূল্যবোধকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যই যথেস্ট নয়। আরবজগত পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শ এবং আরব মূল্যবোধকে রাষ্ট্রচিন্তায় প্রতিফলিত করাই এদের লক্ষ্য।

মহাযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তৃতীয় এক ধরনের আরব জাতীয়তাবাদ। এই প্রকৃতির জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের আরব সত্তা স্বীকার করে নিয়েও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন। এঁদের মূল উদ্দেশ্য সৃষ্ট রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে বৃহত্তর আরব ভ্রাতৃত্ববোধের সূত্র ধরে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সহাবস্থান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে আরব রাজনীতি এই তিনটি ধারার জাতীয়তাবাদ ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে ইজরায়েলের জন্ম এবং প্যালেস্তাইন সমস্যার আলোকে আরব জাতীয়তাবাদ নবকলেবর ধারণ করে আঞ্চলিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছিল, তার পরিণাম পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে প্রকট হয়ে ওঠে।

১৩.৯ অনুশীলনী

১৩.৯.১ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরব উপদ্বীপে অটোমান-বিরোধী জাতীয়তাবাদের নেতা কে ছিলেন?

(খ) মহাযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধোত্তর পর্বে ইরাক এবং সিরিয়াতে কোন বংশের শাসন হবার কথা ছিল?

(গ) সাইক্স পিকো চুক্তি অনুসারে অটোমান সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলগুলি যথাক্রমে ব্রিটিশ এবং ফরাসী শাসনাধীন রাখা হয়েছিল?

(ঘ) উরবা জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

(ঙ) ইসলামী উরবার মূল তত্ত্ব কী?

(চ) সিরিয়া কোন সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে?

(ছ) কবে এবং কোন মিশরের রাজা ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন?

(জ) ১৯১৭ সালের বালফোর ঘোষণায় কী বলা হয়েছিল?

১৩.৯.২

(ক) কোন পরিস্থিতিতে আরব জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়?

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে আরব জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কোথায়?

(গ) আরব জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন ধারা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(ঘ) আরব দুনিয়ার জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঙ) প্যালেস্তাইন সমস্যা আরব জাতীয়তাবাদকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(চ) প্যালেস্তাইন সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন।

১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. G. Lenczowski—Middle East in World Affais.
2. M. Curfis (Ed.)—Religion and Politics in the Middle East.
3. D. Gerner (Ed.)—Understanding Contemporary Middle East.

একক ১৪ ❑ আফ্রিকায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ ইউরোপ ও আফ্রিকা - ১৯৯০
১৪.৩ আফ্রিকায় ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার
১৪.৪ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ
১৪.৫ আফ্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু
১৪.৬ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ইংরেজ শাসিত অঞ্চল
১৪.৭ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ফরাসীদের শাসিত অঞ্চল
১৪.৮ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ পর্তুগাল শাসিত অঞ্চল
১৪.৯ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ বেলজিয়াম শাসিত অঞ্চল
১৪.১০ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ জার্মানি ও ইতালি শাসিত অঞ্চল
১৪.১১ বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত মুখ
১৪.১২ পশ্চিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পরাধীন আফ্রিকা
১৪.১৩ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম
১৪.১৪ অনুশীলনী
১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল থেকে আরব সাগরের ওপারে গেলেই আফ্রিকা। বিশাল মহাদেশ। আশি কোটি লোকের বাসস্থান। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আফ্রিকা আমাদের খুব কাছে। কিন্তু এই মহাদেশ ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের ভীষণ অজ্ঞতা। এই এককের উদ্দেশ্য।

- কিছু তথ্য ও তথ্যবিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই অজ্ঞতার আংশিক দূরীকরণ।
- ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্কের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাব-সাহারার আফ্রিকায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ইউরোপের উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যালোচনা।
- আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভূমিকার আলোচনা।
- সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিল তার আলোচনা।